প্রধান সম্পাদকের কথা

ধর্মহীনের ধর্মভ্রমণ

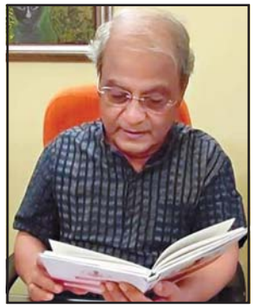

ধর্ম যখন মানুষের স্বভাবসৌন্দর্যের অংশ হয়ে যায়, ধর্মস্থান যখন প্রকৃতির রূপে রহস্যে স্নেহে সমারোহে সুন্দর হয়ে থাকে, তখন সব ধর্মই আমি ভালোবাসি। তখন সব ধর্মস্থানই আমার প্রিয় গন্তব্য। আবার, চারদিকে ধর্মান্ধদের হিংস্র হানাহানি আর ধর্মকে রাজনীতির গোলাবারুদ হতে দেখে দিশাহারা হই। তখন হাতড়ে বেড়াই দেশে-দেশে ছড়ানো আমার যত ধর্মভ্রমণের আনন্দস্মৃতি।

তীর্থযাত্রার পুণ্যের লোভে নয়, অজানা প্রকৃতি-প্রেমের টানে আমার কেদারনাথ যাত্রা এক অবিস্মরণীয় আনন্দযাত্রা হয়ে আছে।

কেদারের পথে প্রথম দিনের আনন্দআশ্রয় রুদ্রপ্রয়াগ। সেখানে অলকানন্দা ও মন্দাকিনী নদীর সগর্জন সঙ্গমের ধারে নতুন তৈরি ট্যুরিস্ট লজে ঘরের লাগোয়া বারান্দা থেকে অনেক রাত অবধি পূর্ণিমার চাঁদ দেখার কথা কখনও ভুলব না। পাহাড় জঙ্গল থেকে লাফিয়ে ওঠা সে চাঁদ। পরদিন গৌরীকুণ্ডে মোটা লেপের নীচে রাত্রিবাসও আমার সুখস্মৃতি। বিশেষ করে বালতি ভরে এনে দেওয়া গৌরীকুণ্ডের গরম জলে স্নানের কষ্টার্জিত আনন্দ। তারপর একই সঙ্গে বিপজ্জনক ও বিস্ময়কর চোদ্দ কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে কেদারনাথ মন্দিরের কাছেই একটা খালি ঘরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙেই মন্দির চত্বর। আর একটু এগোলেই মন্দিরের অভ্যন্তরে সেই প্রাচীন পাথুরে বৃষস্কন্ধ, আমার দেখা হল না। ঘুম ভাঙলে আবার সেই ফেরার পথের রোমাঞ্চে মেতে উঠি। যোশিমঠ থেকেও বদ্রীনাথ মন্দিরের পাহাড়ি বাঁকের পর বাঁক রুদ্ধশ্বাসে উপভোগ করেছি।

অমরনাথে বালতাল থেকে এগারো কিলোমিটার ঘোড়ার পিঠে যেতে যেতে এক কিশোর পিট্টু আমাকে বিপজ্জনক পাহাড়ি রাস্তায় ঘোড়াচড়ার নিয়ম শিখিয়েছিল। তার সেই সহজ পাঠ অনেক বছর পর 'দেবতাদের দেশে' গল্পে হুবহু বসিয়ে দিয়েছিলাম:

''ঘোড়া যখন পাহাড় বেয়ে উঠবে, তুমি সামনের দিকে ঝুঁকে বসবে। আর যখন নীচের দিকে নামবে, তুমি পেছনে হেলে বসবে। পথে ঝরনা পড়বে। ছোট নদী পড়বে। ঘোড়া তার ওপর দিয়ে যাবার সময় জলে মুখ নামাতে চাইলে, জানবে তার তেষ্টা পেয়েছে, সে জল খেতে চায়, তুমি লাগাম আলগা করে দেবে যাতে সে জলে মুখ দিতে পারে।''

কেদারনাথ মন্দির ☐ সুমন চক্রবর্তী

পথের সৌন্দর্যে মগ্ন আমি অমরনাথ মন্দিরে পৌঁছেও মন্দিরের সামনে থেকে অনন্ত চারপাশের বিস্ময়কর দৃশ্যকাব্য দেখতে লাগলাম। মাত্র কয়েকটা সিঁড়ি উঠেই অমরনাথের বিখ্যাত তুষারলিঙ্গ। 'ভ্রমণ' পত্রিকায়ই বেশ কয়েকবার তার খুব সুন্দর ছবি দেখেছি। সেই অগস্ট মাসেই এত কাছে এসেও তার পূর্ণ রূপ দর্শন করার কথা মনে এল না।

একবার যাচ্ছিলাম উত্তরকাশী। পথে হৃষীকেশে গঙ্গার পাড়ে বিশাল এলাকা জোড়া মহর্ষি মহেশ যোগীর পরিত্যক্ত জনশূন্য আশ্রমের একটি ঘরে রাত কাটাবার ব্যবস্থা। সেই ঘর থেকে নীচে সারা রাত খরস্রোতা গঙ্গার শব্দ শোনা যায়।

মহর্ষির আশ্রমে পৌঁছবার অনেক আগে হরিদ্বারে রাস্তা জোড়া জনসমুদ্র দেখে খোঁজ নিয়ে জানলাম, হর-কি-পউরিতে সেবছর পূর্ণ কুম্ভ। সেদিনই রাতে শাহী স্নান। বিরাট পুলিশবাহিনি রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশ মোটা দড়ি ধরে কর্ডন করে রেখেছে যাতে হর-কি-পউরির পথে কেউ না আর এগোতে পারে।

বাধার সামনে যথোপযুক্ত গর্জে উঠে দড়ির শাসন ছিঁড়ে কী করে রাত আটটা নাগাদ হর-কি-পউরির গঙ্গায় কনকনে ঠান্ডা স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কেটেছিলাম, সঙ্গীদের মুখে তার বিবরণ শুনে সেদিন আমার বিশ্বাস হয়নি। অনেক রাতে মহর্ষি মহেশ যোগীর ভূতুড়ে-খাঁখা আশ্রমে রাত কাটিয়ে পরদিন বেলায় উত্তরকাশী পৌঁছে সেখানকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের মুখে শুনে ও তাঁর দেওয়া খবরের কাগজ দেখে মন হাহাকার করে ওঠে। স্নান ও ডুবসাঁতার সেরে আমি ফিরে আসার পরই উত্তরপ্রদেশের কয়েকজন মন্ত্রীর পুণ্যস্নানের ব্যবস্থা করতে অত্যধিক পুলিশি ব্যবস্থার চাপে সেদিন ঘাটে পদপিষ্ট হয়ে ধর্মপ্রাণ বহু মানুষের প্রাণহানি হয়। শুধু সেদিনই নয়, সারা জীবনই দেখে আসছি, এ দেশে প্রবল ধর্মাসক্তি ও ধর্মান্ধ হিংসায় অনেকেরই মৃত্যু ঘটে।

হর-কি-পউরি, হরিদ্বার ☐ প্রবীরকুমার সেন

পড়ে পাওয়া কুম্ভস্নানের মতো মন্দিরদর্শন ভাগ্যও আমার খুবই ভালো। পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরে বা আসামের কামাখ্যা মন্দিরের সামনে সারা ভারতের ভক্তদের লম্বা লাইন এড়িয়ে সরকারি কর্মকর্তাদের সহায়তায় মন্দিরের নির্জন গর্ভগৃহে পৌঁছবার

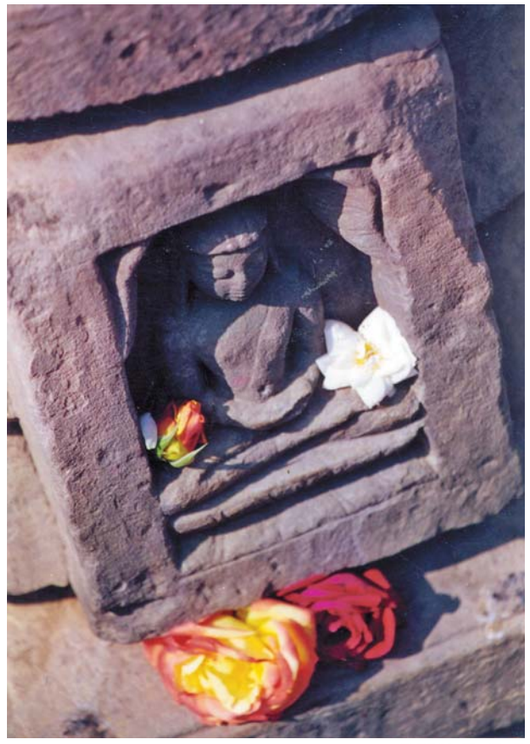

সারনাথে ☐ লেখক

সৌভাগ্যও হয়েছে আমার। পুরীর মন্দিরের পথে বেদ-আবৃত্তিরত তরুণ পাণ্ডা বীর কিশোর মহাপাত্রর সুন্দর উচ্চারণে বেদের সূক্তির পর সূক্তি শুনেছিলাম। তাঁরই সাহায্যে অন্যান্য পাণ্ডাদের ভিড় কাটিয়ে সেদিনের প্রথম দর্শনার্থী হিসেবে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রাদের রাতের পোশাক বদলিয়ে দিনের বস্ত্রসম্ভারে সাজাতেও দেখেছি।

আবার জম্মুর কাটরা থেকে শেষ রাতে ঘোড়ায় চড়ে বৈষ্ণোদেবী মন্দির চত্বরে পৌঁছে আমার মন ওই যাত্রাপথের রোমাঞ্চে এতটাই ভরে উঠেছিল যে সঙ্গীদের জুতো পাহারা দেবার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলাম। পুণ্যার্থীরা জুতো খুলে মাথা পিঠ ঝুঁকিয়ে ওই গুহামন্দিরের দিকে নিশ্চিন্তে এগিয়ে গেলেন। শুনেছি, গুহার কোথাও কোথাও এতটাই আঁকাবাঁকা যে জাগ্রত দেবীকে দেখতে ভক্তদের অষ্টাবক্র মুনির মতো দেহবিভঙ্গের দরকার হয়।

মধ্যপ্রদেশের চিত্রকূটে গুহার মধ্যে গুপ্ত গোদাবরী দর্শনের পর এক জায়গায় বিরাট একটা ঝুলন্ত পাথরখণ্ড দেখিয়ে সরকারি গাইড বললেন, এই পাথরটা কোনও কিছুর সঙ্গে আটকানো নেই, তবু পড়ে যাচ্ছে না। যারা জীবনে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে কোনও না কোনও পাপ করেছে, তারা যেন ওই পাথরের নীচ দিয়ে না যান। কেননা, যুগ যুগ ধরে পাপীর মাথায় ভেঙে পড়ার অপেক্ষায় আছে ওই বিরাট পাথর। গাইডের ভাষ্যে, পাথরটি নাকি আসলে এক রাক্ষস। চিত্রকূটে বনবাসের দিনগুলিতে সীতা নদীতে স্নান সেরে তীরে উঠে সিক্ত বসন বদলাবার সময় ওই রাক্ষস লুকিয়ে তাঁকে দেখেছিল। তারই শাস্তি দিতে লক্ষ্মণ তিরধনু বাগিয়ে রাক্ষসকে তাড়া করে। পালাতে পালাতে শেষমেশ লক্ষ্মণের অভিশাপে এই গুহার সিলিংয়ের মতো মস্ত পাথর হয়ে যায়। শাপমুক্তির জন্য অনেক অনুনয় বিনয়ের পর লক্ষ্মণ তাকে বলে যে কোনও পাপী তার তলা দিয়ে গেলে সে শাপমুক্ত হয়ে সেই পাপীর মাথায় ভেঙে পড়বে।

আমাদের দলের ভারতীয় ও বিদেশি পর্যটকেরা সকলেই পাথরটা এড়িয়ে, বাইরে যাবার গুহামুখের দিকে এগিয়ে গেলেন। আমি মজা করে বললাম, জ্ঞাতে না হোক অজ্ঞাতেও কোনও পাপ করেছি কিনা সেটা যাচাই করার এ তো একটা চমৎকার সুযোগ। দলের সকলের ব্যাকুল নিষেধ সত্ত্বেও আমি গটগট করে পাথরের তলা দিয়ে চলে গেলাম। পাথর যেখানে ঝুলছিল, সেখানেই ঝুলে রইল। ধর্মীয় বা পৌরাণিক কোনও বিশ্বাস যখন ভয় দেখায় তখন তাকে টুসকি মেরে উড়িয়ে দেবার স্বাধীনতা তো মানুষের থাকাই চাই।

কন্যাকুমারী মন্দিরের সিঁড়িতে বিরাট ভিড় দেখে মন্দির চত্বর থেকেই ফিরে এসেছি। আসলে দক্ষিণ ভারতে, ভুবনেশ্বরে বিশাল মন্দিরগুলোর স্থাপত্য ও বিস্ময়কর ভাস্কর্য দেখার নেশায় বহু মন্দির আমি ঘুরেছি। মন্দিরের বিগ্রহও সাধারণত সূক্ষ্ম শিল্পকর্মের একেকটি আশ্চর্য রূপ। তবু সব সময় দেখার সুযোগ হয়নি। মূলত সময়ের অভাবে।

হিমাচলের কাজায় বা অরুণাচলের দিরাং বা তাওয়াঙে বা সিকিমের রুমটেকে বুদ্ধমন্দির কে না দেখেছে!

এবারের এই বৈশাখের মতোই প্রতি বছর বৈশাখ মাসে বুদ্ধ পূর্ণিমায় আমার মন চলে যায় বোরোবুদুরে। বোরোবুদুর, সকলেই জানেন, ইন্দোনেশিয়ার যোগ-জাকার্তায়। বিশ্বের বৃহত্তম বৌদ্ধমন্দির।

বেশ কয়েক বছর আগে ইন্দোনেশিয়ার কয়েকটি দ্বীপের ওপর আমার হাতক্যামেরায় ছবি তৈরির সময় এই বোরোবুদুরে আমি মর্ত্যের এক মহামানবের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করেছি।

১০০ একর জায়গা নিয়ে এই মন্দির। পুরো জায়গাটা তিনটি অংশে ভাগ করা। প্রথম অংশে মূল মন্দির। দ্বিতীয় অংশে বাগান আর তৃতীয় অংশ যুগের প্রয়োজনে কার পার্কিং জোন। এখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে মন্দির। গাড়ি রেখে সবুজ উদ্যানের মধ্যে হেঁটে গিয়ে পৌঁছেছিলাম বোরোবুদুর মন্দিরের সামনে।

বৈশাখ মাসে এই বুদ্ধপূর্ণিমার দিন বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা পৃথিবীর নানা দেশ থেকে এখানে আসেন। সেদিন এখানে সারাদিন ধরে বোরোবুদুর মন্দির প্রদক্ষিণ করা হয়। ন'টা ধাপে উঠে যাওয়া মন্দিরের প্রত্যেকটা ধাপ এঁরা প্রদক্ষিণ করেন। এই ভাবে প্রতিটি ধাপ প্রদক্ষিণ করতে করতে বৌদ্ধধর্মের মানুষ নবম ধাপে উঠে যান। কোনও ধাপে আছে বুদ্ধদেবের ইতিহাস। কোনও ধাপে বৌদ্ধধর্ম দর্শনের কতগুলো অনুশীলন। এই মন্দিরের স্থাপত্য ও মন্দিরগাত্রের মূর্তিসম্ভার দেখে এই বৈশাখী ধর্মসম্মেলন মনে হয় যেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বিশাল একটা ধর্মানুশীলন কেন্দ্র।

বোরোবুদুরে বৈশাখী উৎসবে ☐ পৃথ্বীরাজ চ্যাং

বোরোবুদুর মন্দির ☐ সুবীর কাঞ্জিলাল

বোরোবুদুর মন্দিরে ☐ সুবীর কাঞ্জিলাল

বোরোবুদুর মন্দির প্রায় ৭০০ ফুট উঁচু পাহাড়ের ওপর। অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙে পৌঁছতে হয় মূল মন্দিরের চাতালে। তারপর দফায় দফায় আরও সিঁড়ি ভেঙে ক্রমশ উঠতে হয় বহুতল এই মন্দিরের বিভিন্ন তলায়।

মন্দিরে মোট ন'টি তলা আবার তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত। একেবারে নীচের অংশটি কামধাতু বা কামনা-বাসনার জগৎ। তার উপরের পাঁচটি তলা রূপধাতু, রূপ বা আকারের জগৎ। বোরোবুদুর মন্দির একাধারে বুদ্ধের সমাধি আর বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কাছে তীর্থক্ষেত্র। মন্দিরের নীচের তলা থেকে শুরু করে চারপাশে প্রদক্ষিণ করতে করতে তীর্থযাত্রীরা তিন ধাতুর স্তর পেরিয়ে একেবারে মন্দিরের ন'তলায় পৌঁছে পরিক্রমা শেষ করেন।

মন্দিরে ঢোকার মুখে দু'পাশে দুটি Happy Lions বা সুখী সিংহ। একদম উপরের তিনতলা বাদে পুরো মন্দিরে এইরকম ৩২টি সিংহমূর্তি রয়েছে। এরা মন্দিরের রক্ষক। মন্দির না স্তূপ, বোরোবুদুরকে আসলে কী বলা উচিত তা নিয়ে নানা মতভেদ রয়েছে। ৩২টি সিংহমূর্তি ছাড়া এই মন্দিরের গায়ে রয়েছে ২,৬৭০টি খোদাই করা চিত্র আর ৫০৪টি বুদ্ধমূর্তি। ৩০০টি বুদ্ধমূর্তির মাথার অংশটি নেই আর ৪৩টি মূর্তি নিখোঁজ। আপাতদৃষ্টিতে মূর্তিগুলিকে দেখতে এক মনে হলেও এদের হাতের মুদ্রাগুলো কিন্তু আলাদা। এখানে মোট পাঁচরকম মুদ্রা রয়েছে। উত্তরমুখী বুদ্ধমূর্তিগুলো অভয় মুদ্রা, দক্ষিণমুখী বুদ্ধমূর্তিগুলি বরদা মুদ্রা, পশ্চিমদিকে ধ্যান মুদ্রা, পূর্বদিকে ভূমি স্পর্শ মুদ্রা। উপরের স্তূপগুলোয় যে বুদ্ধমূর্তি তারা রয়েছে ধর্মচক্র মুদ্রায়। মন্দিরের মূল প্রবেশদ্বার পূর্বদিকে।

বৌদ্ধমন্দির বা গুম্ফা বা মনাস্ট্রি দর্শনের স্মৃতি আমার দীর্ঘ। থাইল্যান্ড, মায়ানমার, শ্রীলংকা, চিন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও আরও কয়েকটি দেশেই বৌদ্ধমন্দির দেখেছি। একেকটা মনাস্ট্রিতে দেখার ও ভাবার বিষয়ের শেষ নেই।

মোঙ্গোলিয়ার অনেক মনাস্ট্রির মধ্যে দুটি বোধহয় কোনওদিনই ভুলব না। একটা উলানবাতারে। জ্ঞানদানতেগচিনলেন মনাস্ট্রি। আরেকটা মোঙ্গোলিয়ার প্রাচীন রাজধানী খারাখোরামে, আর্দেন জু মনাস্ট্রি। দ্বাদশ শতাব্দীর ওই মনাস্ট্রিতে বুদ্ধের চোখ থেকে আমি সহজে দৃষ্টি ফেরাতে পারিনি।

আবার জাপানের কিয়োতোয় দুটি বৌদ্ধমন্দিরে রাত্রিবাসের অনন্য অভিজ্ঞতা লাভের ভাগ্যও আমার হয়েছে।

মোঙ্গোলিয়ার উলানবাতারে জ্ঞানদানতেগচিনলেন মনাস্ট্রি ☐ লেখক

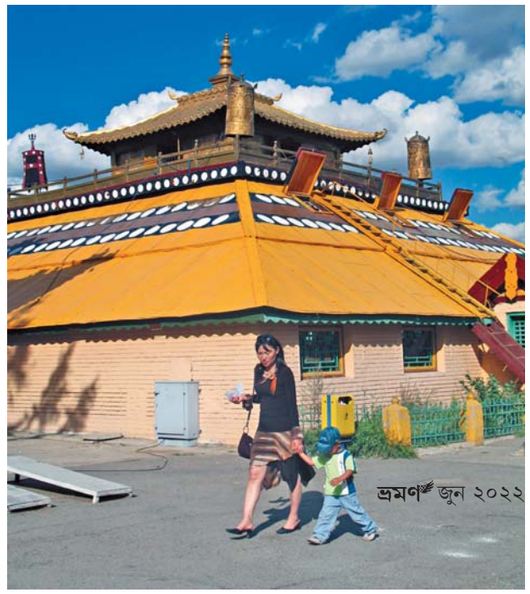

আমার দেখা ভারতের ও ভারতের বাইরের সব তীর্থ ও মন্দিরের কথা বলে শেষ করা যাবে না। শুধু দক্ষিণবঙ্গের সাগরমেলা বা জর্জিয়ার থেতায় থেতা-উৎসবেরই তো কত স্মৃতি! থেতার সেই ধর্মীয় উৎসবে অখণ্ড সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পরে সোভিয়েত-ভাঙা জর্জিয়ার রাষ্ট্রপতি শোভারনাদজেকে ভক্তদের দীর্ঘ সারিতে দেখে খুবই ভালো লেগেছিল।

থেতা যাবার পথ ছেড়ে জুয়ারি বা ছুয়ারিতে জর্জিয়ার সবচেয়ে উঁচু ষষ্ঠ শতাব্দীর গির্জা দর্শন লিখতেও কয়েক পৃষ্ঠা লেগে যাবে।

বৌদ্ধমন্দিরের কথায় মনে পড়ল, বেশ কয়েকটি গুহা নিয়ে জর্জিয়ার আখালসিখেতে পাহাড়শ্রেণির খাঁজে ছড়ানো দশম শতাব্দীর একটি মনাস্ট্রি আছে। সেখানে আমার অভূতপূর্ব একটি অভিজ্ঞতার কথা না বলে পারছি না। নতুন করে না বলে আমার পুরনো একটা লেখা 'আসমুদ্র ককেশাস'-এর 'তুর্কি সীমান্তে' থেকে কয়েক লাইন তুলে দিই:

> সমতল গ্রামের চেয়ে পাহাড়ে সন্ধ্যা নামে দেরিতে, এখানকার পাহাড়ে জঙ্গলে তখন সবে সন্ধ্যা নামছে, তার মধ্যেই দূর থেকে দেখলাম দুজন সুদর্শন শ্মশ্রুগুম্ফময় তরুণ সন্ন্যাসী গুহার দিকে ফিরছেন, সামনাসামনি এসে তাঁদের একজন আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন, অন্যজন কোনও দিকে না তাকিয়ে নিজের পথে ঘন জঙ্গলে ঘেরা গুহার দিকে এগিয়ে গেলেন। আমার সামনের সন্ন্যাসীকে মানানা জর্জিয়ান ভাষায় আমার সম্পর্কে কিছু বলল, তার উত্তরে সন্ন্যাসীও কিছু বললেন, মানানা অনুবাদ করে দিল— 'সন্ন্যাসী বলছে আমার মতো মানুষকে তাঁদের দরকার।' আমার দিকে তাকিয়ে

আজারবাইজানে অগ্নিমন্দিরে লেখক

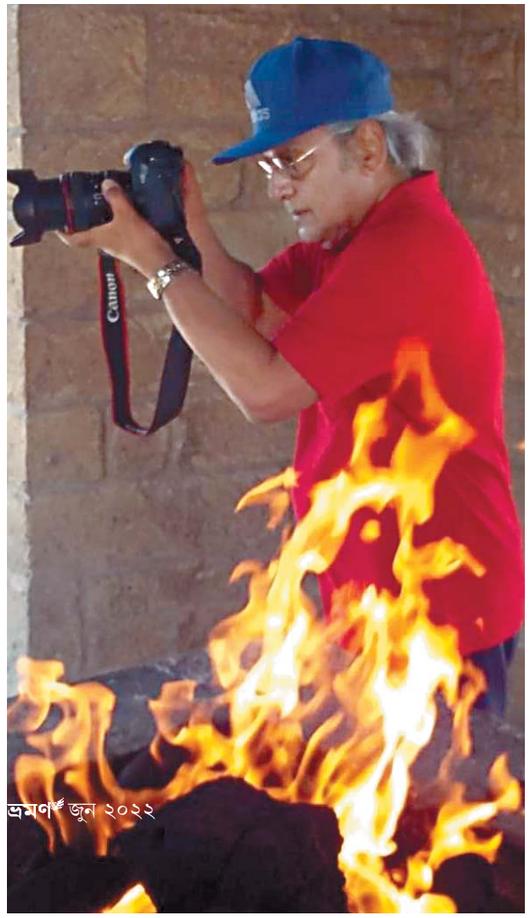

বরিশালে দুর্গাপুজো ☐ লেখক

চমৎকার হেসে তরুণ সন্ন্যাসী আরও যা বললেন, তার অর্থ— ধর্ম আমার মতো লোককেই চায়।

মানানার উত্তর, এর তো নিজস্ব একটা ধর্ম আছে। সন্ন্যাসী ভারি সুন্দর হেসে বললেন, এ ধর্মহীন। এরকম লোককেই ব্যাপটাইজ করা উচিত। হবে নাকি?

শেষের প্রশ্নটি আমার উদ্দেশে। তার অর্থও তাঁর গভীর ও স্নিগ্ধ দৃষ্টি আর নির্মল হাসিতে মানানার মধ্যস্থতা ছাড়াই আন্দাজ করে নিলাম। জর্জিয়া-তুর্কির জনহীন সীমান্তে, মানুষের সমাজ-সংসার থেকে দূরে আদিম অরণ্য-পাহাড়-আবৃত এরকম একটা আশ্চর্য অচেনা সন্ধ্যায় সন্ন্যাসীর অদ্ভুত প্রশ্নে মনে আমার চকিতে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল— সন্ন্যাসী হয়ে স্থায়ীভাবে এখানে থেকে গেলে কেমন হয়!

দেশের বাইরে আজারবাইজানের রাজধানী বাকু থেকে মাত্র ত্রিশ কিলোমিটার দূরে কত কালের প্রাচীন অগ্নিমন্দির। হাজার বছর ধরে হাজার হাজার মাইল অরণ্য পর্বত পার হয়ে এই অগ্নিমন্দিরে অগ্নি-উপাসকদের মহাযাত্রা চলেছে! মন্দিরের বিশাল প্রাঙ্গণে ভক্তদের বিভিন্ন পর্যায়ের মডেল সহযোগে নির্মিত যাদুঘর না দেখেও চলে আসা কঠিন। এমন ধর্মীয় ইতিহাস স্বচক্ষে দেখার আগ্রহ আমার অফুরান।

আমাদের কাশীর পথেঘাটে মন্দিরে ধর্মের শাশ্বত রূপ কে না দেখেছে! ভোর থেকে গোধূলি অবধি গঙ্গার ঘাটে ঘাটে আমি সারা ভারতের হিন্দুদের শাস্ত্রপাঠ ও শাস্ত্রানুশীলন দেখেছি। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কত যে নিয়মনিষ্ঠ আচার-অনুষ্ঠান নিত্যই চলতে থাকে, তা আলাদা লেখার বিষয়।

প্যারিসের ইউনিভার্সিটি সিটিতে ভারতভবনে কবি-ভ্রামণিক প্রীতি সান্যালের উদ্যোগে দুর্গাপূজার আয়োজনে শুধু ভারতীয়দেরই নয়, বিদেশিদেরও মুগ্ধ হতে দেখেছি। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের উপর 'দ্য ট্রি' নামের ছবিটির পরিচালক ফরাসি তরুণীকে দেখেছি মন দিয়ে পুজোর সব শাস্ত্রীয় আচার নিজের নোটবইয়ে লিখে নিচ্ছেন।

দুর্গাপুজো দুই বাংলায় এখন যতটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান, তার চেয়ে বেশি— একটা উৎসব। অনেক মন্দিরে মসজিদে যেমন অন্য ধর্মের মানুষের প্রবেশাধিকার নেই, আমাদের দুর্গোৎসবে কিন্তু সবারই প্রবেশ অবাধ। ঢাকায়, বরিশালে দেখেছি আলোকসজ্জিত সুন্দর সব পূজামণ্ডপে হিন্দুদের মতো মুসলমান পরিবারেরও সমাগম।

বিজয়াদশমীতে প্রতিমা নিরঞ্জনের ছবি তুলতে মাঝরাতে বরিশালের কীর্তনখোলা নদীর অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম। সেখানে নৌকো থেকে লং শটে অত্যুৎসাহী হিন্দু তরুণদের মধ্যে স্থানীয় কিছু মুসলমান ছেলেদেরও দেখা গেছে। বরিশালে আলো ঝলমল

ব্লু মস্ক, ইস্তানবুল ☐ লেখক

পূজামণ্ডপে সুসজ্জিতা হিন্দু নারীদের ভিড়ে চাঁদমুখ বোরখা পরিহিতার দৃশ্যও দুর্লভ নয়।

সব দেশেই দেখেছি, ধর্মের সৌন্দর্য তার উৎসবেই ফোটে। পুরনো ঢাকার শাখারিপাড়ায় ঢোকার মুখে দেখলাম বড় বড় হরফে লেখাও আছে— ''ধর্ম যার যার, উৎসব সবার''।

কায়রোয় আশ্চর্য সুন্দর মসজিদ ইবন তুলুনে ঢোকা না গেলেও বাইরে থেকে তার বিস্ময়কর স্থাপত্য ক্যামেরাবন্দি করেছি। ইস্তানবুলের ব্লু মস্ক শুধু বাইরে থেকেই না, ভেতরে গিয়েও দেখে চোখ জুড়িয়েছি। একসঙ্গে অসংখ্য ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের নামাজ পড়া দেখতে দেখতে মন স্নিগ্ধ হয়। বেইরুটের ব্লু মস্কও রাতের আলোয় অপরূপ হতে দেখেছি।

আবার প্যারিস থেকে মাত্র একশো কিলোমিটার দূরে শার্ত্র ক্যাথিড্রাল। বিশাল এলাকা জুড়ে দ্বাদশ শতাব্দীর এই বিরাট ক্যাথিড্রাল সারাদিন ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার মতো। ভেতর থেকে, বাইরে থেকে, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও ধর্মতত্ত্ব ও তার ইতিহাসের দিক থেকে দেখে চোখ জুড়োয়, মন ভরে। শুধু ফ্রান্স নয়, পৃথিবীর নানা দেশের পর্যটকদের দেখলাম ভারি নিঃশব্দে ভক্তিভরে ঘুরে ঘুরে দেখছেন।

খোদ প্যারিস শহরের নোত্রদাম ক্যাথিড্রাল আগুন লাগার আগেই দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। ভেতরে তখন সার্ভিস চলছিল। প্রার্থনারত ভক্তদের সঙ্গে এক সারিতে বসে অনুষ্ঠানের অনেকটাই দেখেছিলাম। মমার্তের কাছেই সেক্রেড হার্ট ব্যাসিলিকা কিংবা মস্কো ও সেন্ট পিটার্সবুর্গের বিস্ময়কর শিল্পসৌন্দর্য খোদিত অনেক ব্যাসিলিকা ও ক্যাথিড্রাল আজও মনে জ্বল জ্বল করে।

প্যালেস্টাইনে যিশুর জন্মগুহার সামনে নির্বাক দাঁড়িয়ে থেকেছি। জেরুজালেমে ক্রুশবিদ্ধ হবার পর ক্ষতবিক্ষত যিশুর দেহ যে পাথর খণ্ডের উপর এনে শোয়ানো হয় বলে বিশ্বাস, পরবর্তীকালে যেটা হোলি সাপুলকর গির্জা নামে খ্যাত হয়, সেখানে দেখেছি আজও হাজার হাজার খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী এসে বস্ত্রখণ্ড দিয়ে যেন সেই মহামানবের ক্ষত মুছিয়ে দেন।

মন্দির মসজিদ গির্জা সিনাগগ— সব ধর্মস্থানই দেখে বেড়াই মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসের শক্তি, স্থাপত্যের সৌন্দর্য ও ভাস্কর্যের বিস্ময়ের টানে।

তেমনই, কোরান বাইবেলের একাধিক সংস্করণ পড়েছি আখ্যান ও কাব্য পাঠের আনন্দে। অলৌকিক ঘটনা বা অন্ধ বিশ্বাসের অংশগুলিতে মনের সায় না থাকলেও পড়েছি সাহিত্যগুণে মুগ্ধ হয়ে। ধম্মপদ-এ ও কোনও কোনও উপনিষদে মন আমার মগ্ন। আমি বিবিধ ধর্মগ্রন্থ যখন যেটুকু পড়েছি মূলত কবিতা ও সাহিত্য হিসেবে।

ধর্মস্থান আর ধর্মপ্রেম বড় সুন্দর। সেই সুন্দরের টানে ঘুরে বেড়াই মন্দির মসজিদ গির্জায় সিনাগগে। ঘুরে বেড়াই ধর্মের মহিমা ও মহত্ত্ব দেখতে, ধর্ম নিয়ে মারাত্মক মাতামাতি দেখতে নয়। ধর্মে ধর্মে বিদ্বেষ-ই সবচেয়ে বড় অধর্ম।

ধর্ম নিয়ে হানাহানি দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে মনে হয়, ধর্ম যতদিন সব ধর্মের মানুষকে পারস্পরিক ভালোবাসায় না বাঁধে, সব সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রীর সেতু না গড়ে, ততদিন ধর্ম বলে পৃথিবীতে যেন আর কিছু না থাকে!

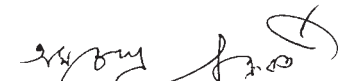

www.amarendrachakravorty.com

হোলি সাপুলকর গির্জায় ☐ লেখক